

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম ও শিল্পদর্শন

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.1
Pages	১-১৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম ও শিল্পদর্শন

বেগম আকতার কামাল*

সার-সংক্ষেপ : বঙ্গীয় ১৩১৯ সাল থেকে ১৩২০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রহ্মভাবনার ধারা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থের রচনায়, *শান্তিনিকেতন* প্রবন্ধমালায়, *আত্মপরিচয়*, *সঞ্চয়* গ্রন্থে এই বিষয়ক চিন্তা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁর কবিতায়-গানে আমরা ঈশ্বরচেতনার নানা রূপক পাই। এই রূপকের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর মিউজ — কবিতা-কল্পনালতা, মানস-সুন্দরী অভিধায় যেমন একজন নারী বা 'তুমি' – এই সর্বনাম, তেমনি জীবনদেবতায়, অর্ধনারীশ্বর প্রতীকে। *গীতাঞ্জলি* পর্বে এসে এই মিউজ হন পরমসত্তা অরূপরতন, *বলাকা* কাব্যে এসে তিনি হন ইতিহাসবিধাতা। তবে আমরা তাঁর ধর্মচিন্তা ও জীবনদর্শনের মিথস্ক্রিয়ায় রচিত *শান্তিনিকেতন*-এ বৈদিক ব্রহ্মের চিন্তন ও বিনির্মাণকে পাই, যাকে ঠিক মিউজ বা অরূপ বলে মনে হয় না। তাঁর ব্রহ্ম ব্রাহ্মসমাজের উপাস্য ঈশ্বর হলেও রবীন্দ্রভাবলোকে এঁর তাৎপর্য ও স্বরূপ অনেক বেশি স্বকীয় ধ্যানধারণায় লব্ধ। বিশেষ করে শিল্পী হিসেবে নিজের রচনার বিষয় ও রূপে তিনি ব্রহ্মকে বয়ন করে নিয়ে লিখেছেন প্রায় ১৫৪টির মতো ব্রহ্মসংগীত। শিল্পীদার্শনিকদের ঈশ্বরদৃষ্টি ও শিল্পসত্তার যে সম্পর্ক সন্ধানের একটা দীর্ঘ ধারা আছে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, সেই আলোকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম ও শিল্পদর্শনের সম্পর্ক সন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

পারিবারিকসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ভক্তিমার্গীয় ধর্মাচারী ছিলেন না। এই ব্রাহ্মসমাজ ছিল বৃহত্তর অর্থে হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারকৃত সম্প্রদায়; অতীতের বৈদিক ভাবাদর্শের আধুনিক কালোপযোগী একেশ্বরবাদ দিয়ে প্রাণিত ও প্রতীচ্যের হিউম্যানিজম দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী ও দার্শনিক হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর বা ব্রহ্মচিন্তার বাইরে নিজস্ব একটি প্রতীতি-রূপ তৈরি করে নিয়েছিলেন যা শিল্পতার সঙ্গে অন্তর্লীন সাজুয্যে সংবেদ্য। এবং শান্তিনিকেতনে অনেক রিচ্যুয়ালকে তিনি প্রবর্তিত করেন যা নিছক পূজারতির পরিবর্তে হয়ে উঠেছে নান্দনিক প্রাকৃতিয়ান। স্মরণ করা যাক ১৯১০ সালের ৪ জুলাই কাদম্বিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র :

> একথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয়নি। তার একটা কারণ অতি শিশুকালেই আমার মনে কবিপ্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল – আমি আমার কল্পনা নিয়েই

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> সর্বদা ভোর হয়ে ছিলুম – ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কী বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি। তার পরে আমার বয়স যখন ১৩-১৪, তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি – তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম। এই বৈষ্ণব কাব্য ও চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এমন কি আমাদের সমাজের ধর্মালোচনার সঙ্গে আমি বিশেষ যুক্ত ছিলুম না ... যখন থেকে আমি আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পক্ষে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ যখন মানুষের সত্যকে না হলে নিতান্ত চলে না তখন সে দেশের খাঁটির যা সংস্কারের টানে কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে আর ভুলিয়ে বেড়াতে কোনোমতে পারে না – এমন কি সে-রকম ফাঁকিতে তার অত্যন্ত একটা ধিক্কার বোধ হয়। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারিনে। (*চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩১১, পৃ-২৭-২৮)

কিন্তু একথাও চিঠিটিতে আছে– "যখন থেকে আমি আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলাম'– এই সাধনা প্রচলিত ধর্ম-আচার নয়, যদিও পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে প্রেরণায় তিনি ধ্যান সাধনা করতেন বলে জানা যায়। এই সাধনা ছিল মন্দিরের ব্রাহ্ম-উপাসনা থেকেও প্রাপ্ত – যা বাল্যে কৈশোরে তিনি অভ্যাস করেছিলেন। তাঁর কবিতায়, গানে ও প্রবন্ধে অরূপরতন, ঈশ্বর, পরমসত্তা, প্রিয়, সখা, বন্ধু ইত্যাকার সম্বোধন একদিকে যেমন সিনক্রনিক বা সঙ্কালিক অন্যদিকে তেমনি ডায়াক্রনিক বা কালানুক্রমিক; যেমন কবিতা-চর্চার শুরুর দিকে *মানসী-সোনার তরী* পর্যায়ে হোমারের মতোই আবিষ্কার করেছিলেন একজন মিউজকে যার রূপমূর্তি নারীর, কবিতা-কল্পনালতা অথবা মানসসুন্দরী নামেও সম্বোধিত। কালক্রমে *চিত্রা* কাব্যে এই মিউজ রূপান্তরিত হয়েছে জীবনদেবতায়, অর্ধনারীশ্বর প্রতীকে, কখনো বা য়ুং কথিত অ্যানিমা-সত্তায়। *গীতাঞ্জলি* পর্বে (১৯১০ পর্যায়ে) এসে এই মিউজ পরমসত্তা বা অরূপরতন হয়ে ওঠে। *বলাকায়*ও (১৯১৪-১৯১৬) আছেন একজন পরম, যিনি কখনো হয়েছেন কূলহারা নেয়ের রূপে একজন ইতিহাসবিধাতা, কখনো হয়েছেন সৃষ্টিলীন 'তুমি-সত্তা' যার সঙ্গে শিল্পী ও বিশ্বের সম্পর্ক ওতপ্রোত ও পারস্পরিক। এই 'তুমি' সৃষ্টিকে অর্থ দেয়, আর তাকে নাম দেয় মানুষের বা কবির ভাষা। আমরা তাঁর ধর্মচিন্তা ও জীবনদর্শনের মিথস্ক্রিয়ায় রচিত *শান্তিনিকেতন*-এ (১৭ খণ্ডে বিন্যস্ত) অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধমালায় বৈদিক ব্রহ্মের চিন্তন ও বিনির্মাণ পাই যাকে ঠিক অরূপ বা মিউজ বলে মনে হয় না। উপনিষদের আলোকে এই ব্রহ্ম ব্রাহ্মসমাজের উপাস্য হলেও রবীন্দ্রভাবলোকে এঁর তাৎপর্য ও স্বরূপ অনেক বেশি চিত্তগহনঘন স্বকীয় ধ্যানধারণার ফলাফল। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন, শিল্পভাবনা, নিসর্গধ্যান, সর্বোপরি মনস্তত্ত্বসম্মত উপাদান রূপে অবচেতন মনের বাসনা-আকাঙ্ক্ষার জটিল অন্তর্বুনন।

প্রচলিত অর্থে ব্রহ্মের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে -- সৃষ্টির আদিকারণ। ব্রাহ্মতাত্ত্বিকেরাও তাঁকে আদিকারণই বলেন। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও বিবর্তনের ইতিহাস সন্ধান করলে আমরা এই আদিকারণের মধ্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ছুঁতে পারব কি-না তা তর্কসাপেক্ষ। তবে উৎসকাল থেকেই ব্রহ্মের অর্থ ভাববাদের পরিমণ্ডলে যুক্ত হয়ে আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ (১৩৪১) বাইশ রকম অর্থ দিয়েছেন। *সংসদ বাংলা অভিধান* (১৯৫৭) বলছে নির্গুণ পরমাত্মা, পরমপুরুষ, অদ্বিতীয়, পরমেশ্বর ইত্যাদি। শব্দটি কর্তৃবাচ্য, বৃন্হ(বৃহৎ)+মনন(মনিন)=ব্রহ্ম, এর আরেক অর্থ হচ্ছে শব্দ, ওঙ্কার। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী তাঁদের *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ*-এ (১৪১৭, ১ম খণ্ড) বলেন যে ব্রহ্ম হচ্ছে 'আবর্তনশীল অতিবাহীর না-করণ-অনাকরণের (বা রহস্যরূপের) হওয়ন বিষয়ক মনন যাহাতে' (পৃ. ১৯৭) অর্থাৎ মননের আবর্তনে রহস্যময় শক্তির অতিবাহী রূপ। অতিব্যাপক, চিরন্তন, অব্যক্ত ইত্যাদি অধিবিদ্যক অর্থও বহন করে শব্দটি। আবার এটি সৃষ্টি ও স্মৃতিরও কর্তা। নির্গুণ ব্রহ্মকেই 'শূন্য' ভাবা হয়, আর সেই শূন্যতা ভরিয়ে তোলার প্রয়োজনেই, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ব্যক্ত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয় রূপকের পর রূপক। এর সঙ্গে অবশ্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে রূপক সৃষ্টির কার্যকারণও জড়িত। মনে রাখা দরকার ব্রহ্ম মহাবিশ্ব নয়, মহাবিশ্ব হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড। অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড বা কোষ, ডিম্ব। ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে ব্রহ্ম যত বিশালই হোক না কেন, মানুষ নামের উন্নত প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডকে পুরে ফেলা যায়। আর যায় বলেই আমরা ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারছি। এ-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আঁটিতে পারে, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্ব"।

শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কী বা কীভাবে? রবীন্দ্রনাথের মতে, 'শিল্প হল সত্যের ডাকে মানুষের সৃষ্টিমুখর অন্তরের সাড়া দেওয়া।' (*মানুষের ধর্ম*) তাঁর এই শিল্পধর্ম-সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি অধিবিদ্যক হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত বক্তব্যে :

> মানুষ হল আলোর সন্তান, যখনি তারা নিজেদের পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তখনি তারা তাদের অমরত্ব অনুভব করে। আর এরূপ অনুভব করেই তাদের অমরত্বের ভুবনকে মানবজীবনের বিশ্ব-সত্য ও সুন্দরের জীবন্ত বিশ্ব নির্মাণই শিল্পের কাজ।
>
> (Personality, *The English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 2)

এই বক্তব্য আরও ইঙ্গিত করে যে, শিল্পসাহিত্যে শুধু মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপ, তার জগৎদৃষ্টিকে নিয়েই রচিত হয় না, মানুষের অধ্যাত্মসত্তা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়েও রচিত হয়। কারণ "মানুষের মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্মসত্তা নিয়েই তার সমগ্রতা' (রবীন্দ্রনাথ)। প্রতীচ্য দর্শনেও দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীতশিল্প ছিল মূলত অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে জড়িত। যে প্লেটো শিল্পীদের তাঁর আদর্শ নগররাষ্ট্র থেকে নির্বাসন

দিতে চেয়েছিলেন তিনিও *আয়ন* ও *ফ্রীডাস* গ্রন্থে দেখান যে সঙ্গীতকে মানুষ আমোদ-আহ্লাদের কাজে ব্যবহার করছে তো বটে কিন্তু ঈশ্বর মূলত সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করেছেন মানবাত্মার অসংযত আবেগগুলিকে সংযত করার জন্যে। আর প্লেটোর ঈশ্বরের/ অ্যাবসলিউটেরই তো অনুকরণে এই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে আর সে সৃষ্টিকে অনুকরণ করে শিল্পসাহিত্য। তাঁর আইডিয়ার পরিকল্পে যেসব নীতিমালা, বিধিবিধান ও নৈতিকতা আছে সেসব তো ঈশ্বরের আদর্শ রাষ্ট্রের বিষয়আশয়। অন্যদিকে সেইন্ট অগাস্টিনও (মৃত্যু ৪৩০ অব্দে) তাঁর *ঈশ্বরের রাজ্য (City of God* গ্রন্থে, ৪২৬ অব্দে)- এ শিল্প ও অধ্যাত্মসত্তাকে একীভূত রূপে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর তাবৎ মহিমাসঙ্গীতগুলিই ঈশ্বর-বিষয়ক। মানুষের সত্তার সমগ্রতায় যেহেতু অধ্যাত্মসত্তা গুরুত্বপূর্ণ অতএব তা শিল্পতত্ত্বের জন্যেও অপরিহার্যই শুধু নয়, জরুরিও বটে। কারণ অধ্যাত্মসত্তা হচ্ছে মানুষের আদি উত্তরাধিকার, মানুষের অস্তিত্ব-সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক জটাজালের সঙ্গে তা জড়িত। এই সত্তা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিরই প্রক্ষেপণ – লুডভিগ ফয়েরবাখের (১৮০৪-১৮৭২) এই ধারণা সর্বাংশে সত্য। বিরূপ প্রতিবেশে ভয়-শঙ্কা থেকে নিজ অস্তিত্বকে মুক্ত রাখার জন্যে মানুষ তার চেয়ে অতিশক্তিশালী ঐশী সত্তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। কাজেই 'ঈশ্বর একা ছিলেন, একা থাকিতে ভয় পাইলেন, তাই তিনি একটি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন' – উপনিষদের এমন কথা মানুষের বেলায়ও প্রযোজ্য। মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ থেকেই নিজের বাইরে অতিশক্তিময় হিসেবে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষেরই আত্মতা (self) যাতে স্বীকৃত তাই হচ্ছে অধ্যাত্মবোধের কেন্দ্র। এই আত্মতাকে সর্বত্র বিরাজিত ও প্রসারিত রূপে দেখবার তাগিদই হচ্ছে ব্রহ্মের সর্বত্র বিরাজমানতাকে স্বীকার করা। আর এর সঙ্গে মানুষের বিশ্বনৈতিকতা বিনির্মাণের প্রসঙ্গটিও জড়িত, কারণ মানুষ কেবল জৈবিক জীব নয়, নৈতিক প্রাণীও বটে, তাকে নিজ ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রশ্নেও সবসময় সক্রিয় থাকতে হয়– কিয়ের্কেগার্দ যেমন বলেন যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনই ঘটে যখন aesthetic আর ethical-এর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে অস্তিত্বযাত্রায় তাঁর আরও বক্তব্য হলো নান্দনিক উপলব্ধিতে তা অঙ্কুরিত, নৈতিক স্তরে আবেগীয় অভিযাত্রা যার সম্ভাবনা, ধর্মীয় স্তরে ঈশ্বরের উপলব্ধিতে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ শিল্পানুভূতি থেকে যাত্রাটা শুরু। তাঁর মতে, শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ নয়, প্রকৃতির অধিবিদ্যান্বিত সম্পূরক – এটি রবীন্দ্রচিন্তারও কাছাকাছি, যদিও কিয়ের্কেগার্দের ঈশ্বর-সংশয়িত রূপটি রবীন্দ্রনাথে প্রবল নয়। মানবব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরকে জানা বা নিশ্চিত ভাবে প্রত্যয় করা অসম্ভব, কণ্টকবৃক্ষের মতো চিরন্তন এক সংশয়ের কাঁটায় বিদ্ধ থাকাই ঈশ্বরমুখী ব্যক্তির পরিণতি। রবীন্দ্রনাথেও মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দেয়, তাই তাঁর ঈশ্বরও কিয়ের্কেগার্দের মতো বড়ো বেদনায় বাজে।

॥২॥

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা অধ্যাত্মবাদ ও ব্রহ্মকে কেন ব্যাখ্যা করব? যেহেতু অধ্যাত্মবোধ দেহধারী প্রাণী তথা মানুষের আত্মাতে বিরাজ করে বা যা 'আত্মাকে অধিকার করে জাত' সেটাই অধ্যাত্ম। একে আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানও বলা যায়। আত্মা বলতে বোঝায় 'অস্তিত্বের পারকরণ', অস্তিত্বের নিজের বাইরে চলা, "এই চলা উড্ডয়ন বা আবর্তিত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা নয়, এ চলা লতিয়ে লতিয়ে চলা, লতার মতো মানুষের সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো" (কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ১ম খণ্ড ১৪১৬ : ২৫)। কাজেই লতানো আত্মাকে যে সকল বিষয় অধিকার করে থাকে সে সকলই অধ্যাত্ম। এটি কোনোমতেই প্রথাগত নিছক ধর্মের আচার-বিচারকে বোঝায় না। প্রাচীনকালে মানুষের সকল প্রকার মানসব্যাপারই অধ্যাত্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে শ্রম ও শ্রেণি বিভাজনের শর্তে অধ্যাত্মজ্ঞানও বিভাজিত হয়ে যায় দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি রূপে। এখানে আমরা নাস্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের ব্যাপারটা উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা বিশেষত সার্তে (১৯০৫-১৯৮০) ঈশ্বরকে নাকচ করলেও অধিবিদ্যার হাত এড়াতে পারেননি; সেখানে অস্তিত্বকে আত্মার মূলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং সত্তার আগে স্থান দেয়া হয়েছে। সার্তের দর্শন ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের অধিবিদ্যক রচনা *গীতাঞ্জলি*কে পাঠ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী (*গীতাঞ্জলি : অস্তিত্ব বিরহ*, ১৯৮৮)। এখানে অস্তিত্বকে ব্রহ্মের স্থানে বসানো হয়েছে।

উনিশ শতকে রামমোহন রায় কর্তৃক অনুভাবিত বৈদিক চিন্তাসমূহের নবায়ন ঘটেছিল। হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাজনের বিপরীতে তিনি যে প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনঃস্থাপন করেছিলেন তা ছিল আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। রেনেসাঁসই এনেছিল এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আর প্রতীচ্যের হিউম্যানিজম ভাবধারা তাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ফলে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আর মানববাদের সূত্রে গড়ে-ওঠা এই ব্রাহ্মধর্মে ছিল জ্ঞানকাণ্ডের অবিভাজন, এতে পাই উপাসনা সঙ্গীত, কাব্যসাহিত্য, তত্ত্বদর্শন। মানুষের মনই ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহায়তায় নিজ নিজ শ্রেয়োসত্তারূপী অধ্যাত্মবোধকে গড়ে তোলে; অন্তত শিল্পী সাহিত্যিকদের বেলায় এটাই ঘটে থাকে। শিল্পসাহিত্য ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জগৎ-জীবনকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না বলে মনের সংশ্লিষ্ট শ্রেয়োবোধের পরাকাষ্ঠা অধ্যাত্মবোধকেও সেখানে নিজের স্থান করে নিতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই যে শ্রেয়োবোধ তা তো অধ্যাত্মবোধিরই সারাৎসার হয়ে উঠেছে। তাঁর সুবিনীত উপলব্ধি ও বোধির আলোকরূপেই আমরা ব্রহ্মভাবনাকে পাই, একই সঙ্গে পাই শিল্পদর্শনের সঙ্গে এটির নিবিড় মিথস্ক্রিয়াও, যেমনটি পাই দার্শনিক ফ্রেডারিক হেগেলের(১৭৭০-১৮৩১) নান্দনিক চিন্তাদর্শেও। এসূত্রে লক্ষ করি যে দুই ভাববাদী প্লেটো ও হেগেলের দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক পর্যায়ে মিল ও অমিল দুটোই আছে। বিশেষ করে প্লেটোর Idea দৈব তা আছে শুধু ঈশ্বরের মনে, আর রবীন্দ্রনাথের

Idea আছে মানুষের চৈতন্যে। এই চৈতন্যস্থিত ব্রহ্মই তাঁর ঈশ্বর – যিনি যতটা বহির্নিস্থিত, তারও বেশি চৈতন্যস্থিত। প্লেটো সত্য ও সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথের মতো জাগতিক দিক থেকে দেখেননি। ব্রহ্মের প্রশ্নে হেগেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাযুজ্য হচ্ছে শিল্পতার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সাহিত্য* গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, পৃ. ৬৪) ঔপনিষদিক সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আলোচনা করতে গিয়ে সৃষ্টির লক্ষ্য হিসেবে মহৎ আনন্দকেই নির্ধারণ করেছেন। আমরা আনন্দ-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার আগে হেগেলের ব্রহ্মের ভাবনার তিন ধাপকে লক্ষ করব, যার প্রথমটি হলো শিল্প, তারপরে শিল্প ধর্মে পরিণত হয় এবং ধর্ম-শিল্প দুটোই শেষ পর্যন্ত দর্শন তথা অধিবিদ্যায় উন্নীত হয়। এই তিন পর্বের মধ্য দিয়ে আত্মার অনন্ত আকুতি মুক্তির প্রয়াস করে। অর্থাৎ শিল্পে, ধর্মে ও দর্শনে একইসঙ্গে রয়েছে আত্মার উপলব্ধির পরিকল্প এবং রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের লীলাবাদকেও এখানে চিহ্নিত করা যাবে।

জীবসত্তা তথা মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁর ধ্যানধারণা সাধনা-ভজনা – সবকিছুর মধ্যে আমরা একমুখী প্রয়াস লক্ষ করি। তার চৈতন্যের – রবীন্দ্রনাথের মতে, ব্রহ্মের আলো ছড়িয়ে পড়ে তার সমগ্র অস্তিত্বে। তাই সেখানে এক অংশকে বা ইন্দ্রিয়কে আরেক অংশের বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিপূরক মনে হয়, কখনো বা এক অংশ অন্য অংশের হয়ে কাজ করে। এরকমটি আবার শিল্প-সাহিত্যের চিত্রকল্প সৃষ্টিরও রহস্য, যেখানে ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পরকে আত্মভূত করে ছবি ফোটায়। প্রাণীর মধ্যে এই শরীরী ইন্দ্রিয়বৃত্তিই গড়ে তোলে ঐক্যানুভূতি আর ঐক্যানুভূতি থেকে সৃষ্ট হয় তার সৌন্দর্য। তবে সৌন্দর্যই শেষ কথা নয়, তার জড় উপাদান হেগেলের Idea-কে পদে পদে ব্যাহত করে। তাই তাঁর মতে, প্রকৃত সৌন্দর্য ত্রুটিযুক্ত, অপূর্ণ। মানুষের মৌল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অপূর্ণতা থেকে পূর্ণের দিকে যাওয়া, এই পথেই জন্ম ঘটে শিল্পের-সঙ্গীতের-কাব্যের-ভাস্কর্যের। এই সৃষ্টিতে প্রকৃতির জড়বস্তু Idea-র প্রকাশকে বরং ব্যাহত করে, বস্তু শিল্পসৃষ্টিতে আত্মা বা spirit-ই সৃষ্টিশীল থাকে বলে শিল্পীরা নিজের সৃষ্টিতে নিজেই মশগুল থাকে। বাইরের জড়বস্তু তখন এই সৃষ্টিশীল আত্মাকে ব্যাহত করতে পারে না। অর্থাৎ হেগেলের ধারণায় শিল্প হলো শিল্পীর মনের পটে Idea-র সম্প্রকাশ। ভাব ও প্রকাশ মিলে সেখানে একটি নতুন সত্তার জন্ম দেয়। শিল্পতা হলো মহাভাব, সার্থক শিল্পে ও শিল্পীচিত্তে এই মহাভাবই প্রকাশিত হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতে এই মহাভাবেরই ব্যঞ্জনা পাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মহাভাব কি সম্পূর্ণভাবে শিল্পে উদ্ভাসিত হতে পারে? রবীন্দ্রনাথেও কি তা হয়েছে? না, হয় না বলেই তাঁর আক্ষেপোক্তি: "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।" এই না-পাওয়াতেই আস্বাদিত হয় শৈল্পিক আনন্দ (aesthetic pleasure) এবং সৃষ্টি হয় নান্দনিকতা। মনে পড়ে নীৎসের ১৮৭১ সালে লেখা *সঙ্গীত থেকে ট্রাজেডির জন্ম* গ্রন্থটি, যাতে বলা হচ্ছে গ্রিক ট্রাজেডির জন্ম পার্বণ ও পুরাণের পারস্পরিক নির্ভরতা ও

সম্পর্কের মধ্যে। মানবিক চেতনা নীতিতত্ত্বে প্রকাশ পায় না, তা মূলত প্রকাশিত হয় শিল্পকর্মে, শিল্পই হচ্ছে সেই দিব্যক্রিয়া যার পরমকর্তা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই শিল্পে প্রকাশিত হয়।

॥৩॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Creative Unity' প্রবন্ধে ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত 'তথ্য ও সত্য' রচনায় সৃষ্টিশীল ঐক্যানুভূতির কথা বলেন যা তথ্যের সঙ্গে সত্যের তফাৎ করে। তাঁর ভাষায়,

> The joy of unity within ourselves, seeking expression, becomes creative, whereas our desire for the fulfilment our needs is constructive.

অর্থাৎ ঐক্যের আনন্দ সৃষ্টির মধ্যেই প্রকাশ ঘটে, আর পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিলাষের মধ্যে বৃহৎ জগতের সঙ্গে নিঃসঙ্গ অন্তরের মিলন ঘটে। এতেই অখণ্ড একের সার্থক সম্মিলন হয়। এই এক-কেই বলা হচ্ছে ব্রহ্ম :

> বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গল-রূপে আছে তা নয়, সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান ও প্রেম চিরনির্ঝরধারা রূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন যে আর নিঃশেষ হল না।
>
> (*রবীন্দ্র-রচনাবলী* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ-৪১৪)

আনন্দেই সকল কিছুতে গতি ও স্থিতির জন্ম হয়। এই আনন্দের পথেই শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ঘটে বলে আনন্দই আবার আত্মার ও পরমাত্মার মর্মকোষ হয়ে ওঠে। শিল্পে আত্মোপলব্ধি বাঙ্ময় হলেই তাকে আমরা বলছি শৈল্পিক আনন্দ। হেগেলের মতে, শিল্প হচ্ছে Absolute-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ– sensouas presentation of the absolute. রূপের মধ্যে, বর্ণের মধ্যে রসের মধ্যে নির্বিশেষ ঐশীসত্তাই অভিসিঞ্চিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল এই ঐশীসত্তার সূত্রে প্রায় কাছাকাছি। তবে, আরও লক্ষণীয় হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তাত্ত্বিক হেগেল কিন্তু ব্রহ্ম ও শিল্পের প্রশ্নে নিজের মননকে দ্বান্দ্বিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেননি। কারণ শিল্পের সৌন্দর্য-আনন্দ সৃষ্টির প্রশ্নটি জটিল ও রহস্যময়, তা ঠিক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সঙ্গে টায়ে-টায়ে শিল্পে ধরা দেয় না। একথা বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক সমাজ-দার্শনিক কার্ল মার্কসও (১৮১৮-১৮৮৩) স্বীকার করেছেন। ফলে জটিল রহস্যময় শিল্পসৃষ্টির বিষয়টিকে হেগেল কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাঁধতে চাননি। তাই তাঁর চিন্তায়নে শিল্পের ব্যাখ্যায় যে ত্রিপদীর কথা আছে তা ইতিহাস ব্যাখ্যার দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের অনুরূপ নয়, এটি ভিন্ন গোত্রীয়। হেগেলের এই শিল্প-ধর্ম-দর্শন–তিন ধাপের মিথস্ক্রিয়ার

অন্যতম দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব পদাবলী। পরমাত্মার হলাদিনী শক্তিরূপিনী রাধার সঙ্গে লীলার মধ্যেই সঙ্গীতগুলি রচিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি মানবীয় রূপের বাইরে কোনো বিমূর্ত কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথেও আমরা সুন্দরের লীলা-প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। তাঁর সুন্দরের লীলার মতোই হেগেলের ব্রহ্মও লীলাবাদী, তবে হেগেলের লীলা ধর্মের পরিধি ছাড়িয়ে দর্শনে দ্রবীভূত হয়ে যায়, যে ইন্দ্রিয়রূপের মধ্যে লীলার বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা তা উত্তীর্ণ হয়ে যায় প্রকৃতি থেকে, শিল্প থেকেও। কিন্তু রাবীন্দ্রিক লীলাবাদ প্রকৃতিময়তায় আশ্লিষ্ট থাকে, আর ধর্মদর্শনকে করে তোলে শুধুই নান্দনিক, তা দর্শনে-ধর্মে দ্রবীভূত হয়ে চিহ্নহীন হয়ে পড়ে না। নাস্তিক অস্তিত্ববাদী হুইডেগারের প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর চিন্তায় ঈসথেটিক, উদ্বেগহীন সহজ অস্তিত্ব থেকে নির্বাচন, নিষ্পত্তি ও উদ্বেগ – এই তিন উপায়ে ব্যক্তি (তাঁর ভাষায় ডাজাইন) খাঁটি অস্তিত্বে উপনীত হয়। তিনি বুঝতে চাইতেন অস্তিত্বচিন্তনকে– ঈশ্বরকে নয়, তাঁর মতে এটা বিইং। বিইং আর ডাজাইনের 'কানাকানি যেন ঈশ্বর-ব্যক্তি সম্পর্কের মতোই।' তাই মনে হয় আস্তিক না হয়েও তিনি একভাবে যেন আস্তিকও বটে।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিন্তাটাই বিপরীত। ব্রহ্মাণ্ডের নানা রূপে তিনি ব্রহ্মের যে প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন সেখানে বিরামহীনভাবে অরূপ-রূপের অসামান্য দ্বান্দ্বিকতা ও সিনথেসিস ঘটতে থাকে। তাঁর অরূপ ব্রহ্মেরই অনির্বচনীয়ের Inexpressibility-এর ভিটগেনস্টাইনের ভাষায় 'প্রকাশ' হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ড; তার অর্ধেকটা নিসর্গে ব্যাপ্ত, বাকি অর্ধেক প্রচ্ছন্ন যা উন্মোচন করেন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা, তারাই অনিবর্চনীয়কে বচনীয় করেন (দ্রষ্টব্য *আত্মপরিচয়* গ্রন্থটি)। আর হেগেলের ধারণা ছিল সেই অসীম অপরূপের কাছে মানুষই প্রার্থী হয়ে আত্মনিবেদন করে; সত্যও এভাবেই ধরা দেয়, সত্য আবার আশ্রয় করে সুন্দরকে আর সেই সুন্দর আশ্রয় করে আছে ব্রহ্মকে অর্থাৎ হেগেলের সুন্দর সত্যাসত্য সাপেক্ষ, তা ভাববাদী আরেক শিল্পতাত্ত্বিক বেনেদিত্তো ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) মতো নিরপেক্ষ নয়। হেগেল তাঁর শিল্প ধর্ম দর্শন – তিন ধাপেই ভাব বা content কে স্বধর্ম বজায় রাখার কথা বলছেন, পার্থক্য ঘটে কেবল প্রকাশরূপের ক্ষেত্রে। প্রকাশভেদেই রূপভেদ ঘটে, ভাব অবৈকল্যে বিরাজ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এস্থলে আত্মোপলব্ধিকে প্রাধান্য দেন যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশকেই নির্বিশেষ সত্য ও সুন্দরের শক্তি করে তোলে। নির্বিশেষ সত্তার বিশিষ্ট প্রকাশই হচ্ছে রূপ, উল্টোটা নয়।

প্রকৃতির অজস্র রূপের পরিমণ্ডলে আমরা সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতা দিয়ে, আগেই বলা হয়েছে হেগেলের ব্রহ্ম পূর্ণ প্রকাশিত হন শুধু শেষপর্যন্ত দর্শনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম অর্ধেক প্রকাশিত বহির্জগতে, বাকি অর্ধেক রচনা করে নেয় শিল্পীর ভাষাবচন। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যে এই যে ব্রহ্মের অনাহত রূপের প্রকাশ তা দার্শনিক ও কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দ্বন্দ্ব তৈরি করে রেখেছে। দার্শনিক হিসেবে তাঁর *শান্তিনিকেতন* প্রবন্ধমালায় তিনি যা বলেন শিল্পী হিসেবে তা বলেন না। এব্যাপারে সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথ কোনো সামঞ্জস্য করতে পারেননি। আমরা *বলাকা*-র

কবিতা পাঠে দেখি কবির জিজ্ঞাসা আর দার্শনিকের প্রত্যুত্তর ভিন্ন হয়ে গেছে। যেমন তাঁর 'ছবি' বা 'শা-জাহান' কবিতা দ্রষ্টব্য। ছবি হয়ে যাওয়া যে মানুষটি আজ কবির জীবনজগতে আর সচল নয়, অস্তিত্বহীন, অদৃশ্য হয়ে মৃত্যুর ওপারে চলে গেছে এই সত্য অনুভব করেন কবি হিসেবে, কিন্তু দার্শনিক রূপে আবার এরকম প্রতীতি আঁকড়ে ধরেন যে, মৃত মানুষটির সত্তা জীবনের মর্মমূলে বিশেষ হয়ে আর প্রকৃতিতে আছে নির্বিশেষ হয়ে, অন্তর্লীন রূপে। 'শা-জাহান' কবিতায়ও দেখি প্রেম হচ্ছে কবির দৃষ্টিতে অবিনশ্বর, তাজমহলের মর্মরসৌধে কলগুঞ্জিত ও উৎসুক প্রেমিক প্রাণের কাছে চিরঞ্জীব। অথচ দর্শনভাবনায় এই প্রেমকে ছাড়িয়ে চিরগতির পথে চলে গেছে ব্যক্তির আত্মা। এখানে প্রেম ও আত্মার মধ্যে যেন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কারণ এই সময় আইনস্টাইনের গতিতত্ত্ব আর আধুনিক চিন্তার সাপেক্ষে সত্যের সূত্রাবলি কবির চেতনায় সংশয় তৈরি করছিল বলে মনে হয়। ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যে এই সংশয় বস্তু পৃথিবীর বিপর্যয় ভাঙনে চিড় ধরিয়েছে *গীতাঞ্জলি*-র সেই অরূপ আর রূপের অভিসারে, দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার চিন্তায়, বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে উদ্বেগাকুল বিরহসঙ্গীতে বিদ্যমান ভাবের ধারাবাহিকতায়। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিকরণ ঘটান, আত্ম-অনুভূতিকে আত্মবহির্ভূত রূপে রূপদান করেন। এখানেই তাঁর শিল্প ও ব্রহ্মের মধ্যে রচিত হয়েছে খানিকটা বিচ্ছেদ। তাঁর ভাবনাটি এরকম যে কবি নিজের কবিতাশিল্পেই সবচেয়ে সৎ ও নির্ভেজাল, 'জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা' (শিলাইদহ, ৮ মে ১৮৯৩)। এসূত্রে আমরা বুঝি যে, কবির সঙ্গে যতটা না ব্রহ্মবাদী দার্শনিকের মিল ঘটেছে, তারও বেশি অন্তর্গভীর সম্পর্কায়ন ঘটেছে কবির সঙ্গে মিস্টিকের– যে মিস্টিসিজম *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে* সুরের খেয়া বেয়েছে। আর যে ব্রহ্মবাদ *শান্তিনিকেতন*-এর প্রবন্ধগুলিকে করে তুলেছে ক্লিশে, একঘেয়ে, কারো মতে বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক, পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (১৮৮৮-১৯৭৫) তাঁর *Philosophy of Rabindranath Tagore* (১৯১৮) গ্রন্থে। তাঁর মিস্টিসিজমে আছে 'মনের মানুষ' সে হলো একজন শিল্পীমানুষ, তা উপনিষদ-বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র-বাউল দর্শন থেকে রস আহরণ করে সঞ্জীবিত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে মনে হয় একান্তই ব্যক্তিময় যা ফয়েরবাখের ভাষায় outward projection of human inner nature. ব্রহ্মই হোক আর অরূপরতনই হোক তা *শান্তিনিকেতন* প্রবন্ধমালায় হয়েছে পিতৃতন্ত্রপ্রধান ও পারিবারিক সামাজিক কাঠামোর উৎসারণ। আর শিল্পসাহিত্যের সৃজনশীল রচনাকার্যে যা বাঙ্ময় হয়েছে, রূপবর্ণিল হয়েছে তা একান্তই অন্তর্বৈশেষিকতার (inner subjectivity) উদ্ভিদতুল্য প্রসারণ, একদিকে শিকড়ে প্রোথিত আরেক দিকে দিগন্তে ঊর্ধ্বমুখী বিস্তারকামী পত্রপল্লবের সূর্যছোঁয়ার বাসনাযুক্ত অর্থাৎ নিসর্গায়ন। এই অন্তর্বৈশেষিকতার সূত্রই, প্রথমে যাকে অরূপ/ব্রহ্ম বলেন শেষ জীবনের প্রত্যয়চিন্তায় তা হয়ে উঠে বিজ্ঞানসূত্রের তেজোরশ্মি, জ্যোতি পদার্থের মৌল এক মহাজ্যোর্তিলোক, সেখানে তিনি প্রাণীসত্তার স্বরূপ দেখবেন বলে আশা করেন।

শেষের কাব্যচতুষ্কে তাই আমরা পাই জ্যোতিষ্কপুঞ্জের নানা প্রতীক, তারা উৎসারিত হয়েছে এক মহাজ্যোতি থেকে– বিজ্ঞানে যাকে বলে energy। আর উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্মতেজস্বরূপ' (আকতার, ২০১৪:৮৯)।

দ্বিতীয় স্ববিরোধ খুঁজে পাওয়া যায় জগৎ যে মায়া মাত্র অথবা মায়া নয় এই প্রশ্নে। সত্য ও সুন্দর মানুষের অনুভূতি সাপেক্ষ, এটা রবীন্দ্রনাথের বেলায় আগেই আমরা চিহ্নিত করেছি, যা নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল। আইনস্টাইনের সুন্দর ও সত্য ধারণা নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তি না থাকলেও জগৎ থাকে। ব্যক্তিনির্ভর সত্যের ধারণা পোষণকারী রবীন্দ্রনাথ এক পর্যায়ে শিল্পকে 'মায়া' বলেন যেমনটি প্রাচীন ভারতীয় রসজ্ঞরা বলেছেন জগৎও মায়া, শিল্পও অলৌকিক মায়ার জগৎ রচনা করে। আবার দ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ গণ্য করেন বলে জগৎ তো তাঁর কাছে মায়া বা মিথ্যা নয়। বরং অধিবিদ্যার কল্পিত মায়া জগৎটিই শূন্য, তার ভাষা ও নিজেকে ব্যক্ত করার ভাষাও অতএব শূন্য। তাই ব্রহ্ম বা অধ্যাত্মকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে বারংবার অবলম্বন করতে হয় দৃশ্যমান জগৎকে ও মানবানুভূতিকে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রূপকগুলিকে। সঙ্গীত এক্ষেত্রে বিশেষ শিল্পায়নের স্রষ্টা, সুরের জাদুময়তা ও উত্থানপতন-সংঘাতে সত্তার নির্বিকার নাস্তিত্বও/শূন্যতাও একসময় আস্তিত্ব পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথে তা হয় পূজা ও প্রার্থনার গান, আর হেগেলে তা ধাপে ধাপে অ্যাবসলিউটের গর্ভে অবলীন হয়ে যায়। হেগেলের ব্রহ্ম-অনুভূতিও প্রকৃতিসহ একটা সমগ্রতায় বাঁধা পড়েন রূপের জালে ও বিকশিত হন, রূপ থেকে রূপকে রূপান্তরিত হন।

॥৪॥

রোমান্টিক শিল্পীরা নিজেকেই সম্পূর্ণ মন্ময়ান্বিত করে আত্মময়তার নতুন বলয় গড়ে তোলে। আত্মার (soul) পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় আত্ম (self)। তাঁদের শিল্পে তুলনামূলকভাবে নিজেই মহাভাব-রূপে প্রকাশিত হতে থাকেন। প্রকৃতির রূপ আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। আমরা রোমান্টিক-মিস্টিক রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্মেও দেখি শেষপর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে মহাভাবের স্বকীয় প্রকাশরীতি বিনির্মাণ করে। এই নির্মাণে আত্মাই পরিস্ফুটিত হয়েছে। হেগেলের মতো প্রকৃতিলগ্ন ব্রহ্মকে তিনি আহত, খণ্ডরূপে দেখেননি, বরং নিসর্গের রূপেরসেবর্ণে মন্ময়াত্মক করে তুলেছেন। বিশেষ করে সঙ্গীতের মধ্যে বস্তুজগৎকে রূপময় অথচ বস্তুনির্ভার করে ব্রহ্মকে দ্যোতিত করেছেন, তাঁকে আর দ্যোতক করেন নি। আরও একটি সূত্রে হেগেলের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়, যেমন হেগেল তাঁর *Philosophy of Fine Art* এ বলেন যেঃ It emlodies pure identity and subjective emotion in the configuration of essentially resonant sound rather than invisible form. কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বাণী/শব্দ সুরের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা অর্থকে ভাবকেই দৃশ্যমান করে। কাজেই কাব্যে মহাভাবের সুন্দর দৃশ্যায়ন ঘটার ফলে হেগেলের আর্ট

যখন বিলুপ্ত হয় ধর্মের গহ্বরে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। আর্ট কখনো মৃত হয় না। তাঁর *Religion of Man* এবং *Religion of an Artist* গ্রন্থদুটিতে ভাবনার ঐক্য আছে যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভাস্কর্য সঙ্গীত-নৃত্য-কাব্যে সৌন্দর্য রচনাকারী শিল্পীমনের দিকে। 'শিল্প কী' এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয়েছে তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা এড়িয়ে। উত্তরটি হলো, মহাসত্তা বা ব্রহ্মের আহ্বানে মানুষের সাড়া প্রদানই হচ্ছে তার সৃজনক্ষম প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আর্ট হচ্ছে মানুষের সৃজনশীল আত্মার উন্মোচন। অতএব শিল্প প্লেটোর মতো প্রকৃতির নকল করে না। প্রকৃতি ব্যবহৃত হলেও তা শিল্পীমনের অনুরঞ্জনে ভিন্ন হয়ে যায়, হয়ে ওঠে প্রকৃতির আদর্শায়িত রূপ রবীন্দ্রনাথ এখানে আরিস্টটলের কাছাকাছি থাকেন এই অর্থে যে, আরিস্টটলও আদর্শ বাস্তবকে শিল্প তৈরি করার কথা বলেছেন। শিল্প মানুষের সহজাত বৃত্তি, এই বৃত্তির হাতে ধরা পড়ে বাইরের প্রকৃতি ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ, শিল্পীর গ্রহিষ্ণু মনকে তা আলোড়িত করে এবং মনের পরিসর পেরিয়ে সেই প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ বিচিত্ররূপে আবির্ভূত হয়। এই রূপের আলোতেই শিল্পভুবন আলোকিত হয় – হেগেলের ব্রহ্মের মতো অ্যাবসলিউটের আলোতে আলোকিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ রূপকে যেমন সত্য বলেন রূপের উৎস উপাদানকেও সমান সত্য বলেন। তবে শিল্পের উৎসকেন্দ্র এক ব্রহ্ম হলেও উপাদান কিন্তু বহু। শিল্পীর কাছে এই বহুল বস্তুই সত্য, রূপই অগ্রগণ্য – মহাভাব নয়। এটা গ্রিক সুমিতিবাদ বা সুষমারীতি যা শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় কাজ করেছিল। তাই essence-এর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে appearance, তখন subjectivity-কেও আর একমাত্র বলছেন না, বলছেন experience-র কথাও, আবার ভিন্ন ভাবে বলেন যে প্রকাশ মুখ্য হলেও সেটা শিল্পের সর্বস্ব নয়। এটাও তাঁর শিল্পবিষয়ক চিন্তাজটের নমুনা।

প্রথমে যে ইন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম নিয়ে সমগ্র সত্তার কথা আমরা বলেছি তা আনন্দ, সুন্দর, সত্য ও প্রকাশ– সর্বোপরি লীলাবাদ দ্বারা মিলেমিশে নানাপ্রকারের হয়ে গেছে। অদ্বৈতবাদীদের মতো এক পর্যায়ে যখন রবীন্দ্রনাথ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য দেখেন না, আগেই বলেছি তা কিন্তু হেগেলের অ্যাবসলিউটকে বোঝায় না। বোঝায় এক সচ্চিদানন্দকে, পরমাত্মার এই আনন্দরূপ অঙ্গীভূত ব্যাপার যা জীবাত্মা তথা শিল্পীরাই মাত্র তাঁদের রচনাকর্মে পেতে পারেন। শিল্প তাঁর কাছে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। শিল্পানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে কোনো ভেদ রবীন্দ্রনাথ আর দেখতে পান না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ না থাকলে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের কী হবে? তা কি থাকবে, না বিলীন হয়ে যাবে? রবীন্দ্রমতে শুধু শিল্পানুভূতিই নয়, শিল্পে ব্যক্তিচরিত্রও বজায় থাকবে (*সাহিত্যের পথে* দ্রষ্টব্য), কবিকে তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাবে না, যাবে শিল্পেসাহিত্যে। যে প্রাণপ্রেতি বিচিত্র সাজে জীবনকে সাজায়, নানা রঙে রাঙায় তার স্পর্শ থাকে তাঁর সৃষ্টিতে, জীবনচরিতে নয়। তাহলে বলব কি যে, প্রাণপ্রেতি তথা প্রাণস্যপ্রাণংই কি ব্রহ্ম, না তা বিজ্ঞানের মৌল তেজ পদার্থ? এ প্রশ্নের সমাধান নেই,

তা শেষ পর্যন্তও ছলনাময়ীর বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ হয়ে নিরুত্তর থেকেছে রবীন্দ্র চেতনায়, প্রথম ও শেষদিনের কোনো সূর্যই তাই উত্তর পায়নি।

॥৫॥

বেদের ভাষ্যকারেরা যজ্ঞশেষের অতিরিক্ত হবিকে বলেন 'ব্রহ্ম-স্বরূপ'। পিতাস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মই আবার সৃষ্টির উৎস। এই অতিরিক্তটুকুই জীবনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও সুষমার দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ এই অতিরিক্ত অপ্রয়োজনকেই বলেন রসজগতের বিষয়আশয়। যেখানে প্রয়োজন নেই, চাহিদা নেই, সেখানে প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বও নেই। শিল্প অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্র। তাঁর এই ধারণা সবসময় এক থাকেনি। রবীন্দ্রনাথ এর বিপরীত কথাও বলেন যে শিল্প আমাদের চিত্তকে উন্নত করে। তাঁর ব্রহ্মসংগীতগুলির পঠনপাঠনে আমরা দেখতে পাই যে এগুলি কবিতাশিল্পেরও পরাকাষ্ঠা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এগুলির কাব্যত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। তাঁর মতে,

> সংগীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।.... তাল ও ভাব প্রকাশের একটা উপায়। আমি সংগীতকে চেতনাহীন জড় সুর মনে করি না, তাকে জীবন্ত অমর ভাব মনে করি। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী রচনা করা হত, আমাদের রাগ-রাগিণীর ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল।
>
> (১৮৮১ খ্রি. ১৯ এপ্রিল বেথুন সোসাইটিকে প্রদত্ত বক্তৃতা)

অর্থাৎ আবেগের ভাষাই সঙ্গীতের মূল আশ্রয়। আবেগের ভাষা থেকে জন্ম নিয়ে তা আবার আবেগের ভাষাকেই পরিস্ফুট করে, অনুভব প্রকাশের অতি উন্নতিই সঙ্গীত। প্রথম বয়সে তিনি গানে হৃদয়ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তাঁর পরিণত বয়সের গানগুলিতে আছে রূপ, ভাবসংশ্লিষ্ট গানগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন। তাঁর মতে, সঙ্গীত অবশ্যই ভূমার সুর। তার বৈরাগ্য, শান্তি, গভীরতাই আমাদের চিত্তের সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে বিনাশ করে। এই রূপসংশ্লিষ্ট ভাবগভীরতাই তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্লীন আধেয়, এই অন্তর্লীনতাই অধিবিদ্যার সর্বসম্ভাবনাকে ব্যবহার করেছে। কাজেই *শান্তিনিকেতন* প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথের অধিবিদ্যক বচনকে একই অর্থের দ্যোতক মনে হলেও সঙ্গীতগুলির বাচনিক রূপ একান্তই নান্দনিক ও দার্শনিক ও বহুত্ববাদী। তাঁর চিন্তন ও সুরের খেয়ায় পাড়ি দেয় মেঘাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট জগৎ থেকে বিপুল আলোপরিধিতে, নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের দীপ্তিশোভায়। আমরা সাধক বিবেকানন্দকেও দেখি নন্দনসত্তার মধ্য দিয়ে পরমের সাযুজ্য ও সামীপ্য লাভ করতে। এক পর্যায়ে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে কবি, বলা হয়েছে মনের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু হিসেবে। এই কবিমনীষাই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক ও স্রষ্টা। তাঁকে পেলেই সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত কারণকে পাওয়া যায়, কারণ ব্রহ্মই আদি-কারণ।

কবিই একমাত্র আদিকারণের রহস্য জ্ঞাত হন। কবিরই ঘটে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, কারণ ব্রহ্মকে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের পথেই পাওয়া যায়। নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ হলো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর।

ব্রহ্ম ও শিল্পের সম্বন্ধসূত্রটাকে বিপরীত দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। সীমাকে লোপ করে অসীমের দিকে যাত্রার কথাটা আছে অধ্যাত্মবাদে, শিল্পে নেই। অসীম যেদিকটায় সীমার রূপ পরিগ্রহ করে সেদিকটাতেই শিল্পের রাজত্ব। অধ্যাত্ম আর নৈসর্গিক শিল্পীপ্রতিভার এই মিলনবিন্দুটি ঠিক যীশুর ক্রসের মতো যেখানে উল্লম্ব আসে নিচের দিকে আর অনুভূমিক সমান্তরাল রেখায় বিন্দুবদ্ধ হয় ক্রুশের মধ্যখানে। ঈশ্বরকে অনুভূমিক হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্বে যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই মিলনসম্পর্কটি–' সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/ আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত সুমধুর"। এই আমিটাই মূলকেন্দ্র।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যশিল্পে দেখা গেছে যে, ধর্মকে আশ্রয় করে যখনই শিল্প আত্মপ্রকাশ করছে তা পৌরাণিক উপকরণে আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতে তা হয়নি। সেখানে মানবীয় জীবনবোধ, মানবিক সীমা-অসীমতার পারাপার আছে, আছে মানবস্বভাবের বহুরঙ্গলীলা, তাই সুরে-বাণীতে তিনি যে রূপজগৎ সৃষ্টি করেছেন তা প্লেটোর ভাবসত্তা-রূপ হয়নি, হেগেলের ধর্মলীনতাও হয়নি, হয়েছে ভাষারই ভাবরূপ। ধর্ম যদি মানবস্বভাবকে অধিকার করে থাকে তবে সেই স্বভাব বিশ্বজগৎকে পূর্ণরূপে দেখতে দেয় না। একমাত্র শিল্পই দেখায় জগতের সামগ্রিক রূপ। তাই ধর্মের চেয়ে শিল্প অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের এই পূর্ণতাকে করে তুলেছেন ব্রহ্মের সমতালিক, তাঁর মতে মানবাত্মার মধ্যেই ঐক্যবোধ আছে, আছে সমগ্রতা, আর আছে জগৎ – এই সবেরই অভিমুখিনতা হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মধ্যে যেমন পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা লীন হয়ে রয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের শিল্পেও সৌন্দর্য, প্রেম, মুক্তি, আনন্দ ইত্যাকার মানবীয় প্রত্যয়ের অন্তর্লীন মিথস্ক্রিয়া ঘটে। তবে উত্তরাধুনিক ভাবনায় জাক দেরিদা ভাষাগত অধিবিদ্যাকে ধ্বংস করার যে ডিসর্কোস উত্থাপন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির ভাষাকে সেখানে কীভাবে দেখা হবে? অধিবিদ্যক বাচনকে অস্বীকার করলেও তাদের অস্তিত্বকে যেমন দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন অস্বীকার করেননি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বাচন – যা হয়ে উঠেছে বাণী সেগুলিকেও নস্যাৎ করা যায় না। নিবিড় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এসব অধিবিদ্যক বাচনে লুকিয়ে আছে অধিবিদ্যক ভাষার বিরোধিতাও, যা খুবই কৌতূহলপ্রদ ও নতুন ব্যঞ্জনাবহ – যা আসলে জীবনকেই দ্যোতিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্দশ ও ষষ্ঠ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ ১৪০২), বিশ্বভারতী

২. সুধীরকুমার নন্দী (২০১৪)। 'রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব' (প্রবন্ধ), *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*, সম্পাদনা : প্রদীপকুমার নন্দী, অবসর, ঢাকা
৩. ঐ, 'হেগেলীয় শিল্পতত্ত্ব' (প্রবন্ধ), তদেব
৪. অরুণ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা' (প্রবন্ধ) তদেব
৫. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৪১৬ বঙ্গাব্দ) : *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ*, ১ম খণ্ড, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা
৬. বেগম আকতার কামাল (২০১৪) : *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, অবসর, ঢাকা
৭. Hegel's Asthetics (1975). *Lecture on Fine Art*, 2 vol. Oxford : Claren dom press
৮. Ludvig Wittgenstien (1978). *Philosophical Investigation*, Tr. G.E.M. Ansecombe, Oxford, Basil Blackwell
৯. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (1918). *Philosophy of Rabindranath Tagore*, New Delhi
১০. Rabindranath Tagore (1994). Personality. *The English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 2, edited by Sisir Kumar Das, New Delhi, Sahitaya Akademy
১১. Soren Kierkegaard (1843). *Fear and Trembling*, Psendonym Johannes de Siletio, Denmark